আমরা ফেলুদা

সন ১৪২২

ইং ২০১৫-১৬

e - নববর্ষ সংখ্যা

FFC

শুভ নববর্ষ ১৪২২

আমরা ফেলুদা

e-নববর্ষ সংখ্যা ১৪২২

FFC

"~FELUDA FAN CLUB~"

https://www.facebook.com/groups/feluda.3musketeres

সূ.চি.প.ত্র

আমাদের কথা ১

গল্প

শিয়ালদা স্টেশনে ● সোমনাথ আচার্য ২

কবরখানার চৌকিদার ● উজ্জ্বল দত্ত ১০

ভুল ঠিকানা ● সৌম্যদীপ পাল ১৯

কবিতা

একটা আর্জি... ফেলুদার কাছে ● স্বাতী চ্যাটার্জ্জী ভৌমিক ৪

আমরা ও ফেলুদা ● দীপান্বিতা ভট্টাচার্য ৯

ফেলুদার প্রতি নিবেদন ● রজত চক্রবর্তী ১৬

কবি মস্তান ● সম্বিতা ১৬

তুষার ও লবন ● সায়নদীপ চট্টোপাধ্যায় ১৮

সুখের সন্ধান ● মোঃ আঃ মুকতাদির ২২

তোমার আমার ছাদ ● শিবাদিত্য দাশশর্মা ২২

বিশেষ আকর্ষন

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় ● চিরঞ্জীৎ দাস ৫

ডাক টিকিটের সংগ্রহ ● শুভঙ্কর ঘোষ ১৫

পেইন্টিং ও ফটোগ্রাফি

সৌম্যদীপ পাল, রজত চক্রবর্তী, শুভঙ্কর ঘোষ এবং দিপান্বীতা ভট্টাচার্য

প্রচ্ছদ

সৌজন্যে Doodlers

অলঙ্করন

চিরঞ্জীৎ দাস

সম্পাদক মণ্ডলী

উজ্জ্বল দত্ত, সহেলী রায়, অঙ্গনা সেনগুপ্ত, চিরঞ্জীৎ দাস, সোমা মজুমদার, রৌনক ব্রাউন, দেবায়ন ঘোষ, সৌমী মল্লিক, শুক্লা সিংহ, শুভদীপ ভট্টাচার্য, সায়নদীপ চট্টোপাধ্যায়, আখর বন্দ্যোপাধ্যায় এবং রক্তিম আচার্য

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

ইলাসট্রেসনে ব্যবহৃত বিভিন্ন স্কেচ ও ড্রইং এর আর্টিস্ট
ও আপলোডারদের কাছে আমরা কৃতজ্ঞ

প্রকাশক

ফেলুদা ফ্যান ক্লাব

আমাদের কথা

ফেলুদা ফ্যান ক্লাবের মাননীয় সদস্যবৃন্দ, ভাই বোনেরা ও শ্রদ্ধেয় গুরুজনেরা,

শুভ নববর্ষ ১৪২২। আপনাদের ভালোবাসা আশীর্বাদ স্নেহের দ্বারা উৎসাহিত হয়ে আবার আমরা আপনাদের কাছে প্রস্তুত করছি আপনাদের সবার প্রিয় ফেলুদা ফ্যান ক্লাবের পত্রিকার নববর্ষ সংখ্যা। এর আগেও আমরা আমাদের পত্রিকা নিয়ে অনেকবার আপনাদের কাছে গেছি ও আপনাদের মনোরঞ্জন করতে সক্ষম হয়েছি।

এই নববর্ষ সংখ্যা ও আপনাদের সবার ভালো লাগবে এই আশা রাখি।

ফেলুদা – তোপসে – লালমোহনবাবু হলেন বাংলা সাহিত্যের ত্রি-রত্ন। আর এই ত্রি-রত্ন আপনাদের সবার প্রিয়। এই ত্রি-রত্নর দ্বারা অনুপ্রাণীত আমাদের গ্রুপ ফেলুদা ফ্যান ক্লাব। তাই এই ত্রি-রত্নর কথা মাথায় রেখে আমরা সবসময় চেষ্টা করি আমাদের পত্রিকাকেও নানা ভাবে সাজিয়ে বর্ণময় করে তুলতে। আর এতে আমাদের সাহায্য করেন ফেলুদা ফ্যান ক্লাবের সদস্য, লেখক, কবি ও শিল্পীরা।

ফেলুদার সৃষ্টি কর্তা ছিলেন একজন অসাধারণ প্রতিভাধর মানুষ। তার প্রতিভার প্রতিফলনই আমরা দেখি এই ত্রি-রত্নর মাঝে। ফেলুদার কাহিনী গুলোর চরিত্ররা কিন্তু বহুমুখী। গোয়েন্দাগিরি ফেলুদার কাহিনী গুলির মাত্র একটা দিক। গোয়েন্দাগিরি ছাড়াও এতে আছে কখনও ভ্রমন, কখনও ম্যাজিক, কখনও হাসি ঠাট্টা মজা, আবার কখনও বা ইতিহাস।

তাই এই ত্রি-রত্ন আজ এতো বছর ধরে আমাদের মনোরঞ্জন করে চলেছে। এই আদর্শকে মাথায় রেখে আমরা আমাদের পত্রিকাকেও সাজিয়ে তুলেছি নানা ভাবে। এই ত্রি-রত্ন যেমন আমাদের অনাবিল আনন্দ প্রদান করে গেছেন আমাদের এই পত্রিকারও উদ্দেশ্য তাই আপনাদের সবার ব্যস্ত জীবনে খানিকটা আনন্দের স্পর্শ লাগানো। আমাদের এই খুদ্র প্রচেষ্টা যদি আপনাদের হৃদয়ে একটুও ছাপ ফেলতে পারে তাহলেই আমাদের সব পরিশ্রম সার্থক হবে।

বিনীত অনুরোধ শুধু এই যে, পত্রিকা আপনাদের পছন্দের মানদন্ডে উত্তীর্ণ হলে আমাদের এক লাইন হলেও লিখে জানান। তাহলে আমরা উৎসাহিত হব, অনুপ্রাণীত হব। ভবিষ্যতে আপনারা এই পত্রিকায় আরও কী কী দেখতে চান তাও যদি আমাদের জানান তাহলে আমরা বাধিত হব। আর যদি আপনাদের দৃষ্টিতে কোনো ভুল ত্রুটি ধরা পরে তাহলে সে ব্যাপারেও আমাদের অবহিত করুন যাতে আমরা আমাদের ভুল ত্রুটি গুলোকে শুধরে নিতে পারি।

নববর্ষ ১৪২২ আপনাদের সবার জন্য মঙ্গলময় হোক এই প্রার্থনা জানিয়ে ও সবাইকে নমস্কার ও শুভেচ্ছা জানিয়ে আজ শেষ করছি।

বিনয়াবনত

ফেলুদা ফ্যান ক্লাব নিবেদিত

নববর্ষ ১৪২২ সংখ্যা পত্রিকার

সম্পাদক, সম্পাদীকা বৃন্দ

শিয়ালদা স্টেশনে

সোমনাথ আচার্য

দুপুরবেলার ট্রেন, তাই স্বাভাবিকভাবেই বেশ ফাঁকা | বালিগঞ্জ স্টেশন থেকে একটা ছেলে উঠলো ট্রেনে | চোদ্দ-পনেরো বছর বয়স, বেশ মলিন চেহারা, রুক্ষ লালচে চুল, পরনে অন্য কারোর থেকে যোগার করা বাতিল জামাকাপড়, খালি পা | ছেলেটার মুখে একটা বিষন্ন ভাব দেখেই বুঝতে পেরেছি এ ভিক্ষাবৃত্তি করতেই উঠেছে | প্রায় ফাঁকা হয়ে আসা কম্পার্টমেন্টের অন্য দিকে গিয়ে কয়েকজনের কাছে হাত পেতে কিছু খুচরো পয়সা যোগার করে ফেলল সে | তারপর পার্কসার্কাস স্টেশন ছাড়ার পরেই ছেলেটা আমার কাছে এলো | দুঃখী চেহারায় আমার দিকে তাকিয়ে থেকে বলল-"কিছু সাহায্য করুন, আমার বাবার খুব অসুখ |"

প্রথমে ছেলেটার কথায় বিশেষ আমল দিলাম না | এরকম কত মিথ্যে অজুহাত নিয়ে আজকাল ট্রেনে ট্রেনে বাচ্চা ছেলেরা ভিক্ষাবৃত্তি করে বেড়ায় | কতরকম বেআইনী সিন্ডিকেট ও থাকে যারা প্রতিদিন অল্প টাকার বিনিময়ে এইসব গরিব ছেলেমেয়েদের দিয়ে ভিক্ষা করিয়ে নেয় | আমি মুখ ফিরিয়ে নিলাম ঠিকই ; তবে তাও একবার ইচ্ছে হলো ছেলেটাকে যাচাই করে দেখি | ছেলেটা ততক্ষণে আমার পাশে আরও কয়েকজনের কাছে ভিক্ষা চেয়ে বিফল হয়েছে |

আমি ওকে ডাকলাম-"এই শোন"

ছেলেটা আবারও সেই একইভাবে আমার দিকে তাকিয়ে রইলো |

বললাম-"কি নাম তোর ?"

-"মনোজ' ছেলেটা উত্তর দিল |

-"বাবার কি অসুখ হয়েছে ?'

-"ও-অস্তীয় পোরোসি ...' মনোজ দ্রুত কিছু একটা ভেবে উত্তরটা দিলো | ও যে রোগের নাম বলতে চাইলো সেটা আসলে হবে 'অস্টিওপোরোসিস' | এই রোগের ফলে শরীরের হাড় ভঙ্গুর হয় পড়ে |

আমি একটু চালাকি করে বললাম-"সে কি রে! এ তো বড় ভয়ানক রোগ | তোর বাবা তাহলে তো খুব পাগলামি করে মনে হয় | এই রোগ হলে তো মানুষের মাথা খারাপ হয়ে যায়।"

মনোজ এবার চোখ বড়ো করে বলল -" হ্যাঁ গো | আমার বাবা আমার মাকে রোজ পেটায় | বোনটাকেও হেব্বি মার মারে |"

এবার নিজের চালাকি বুদ্ধির প্রশংসা না করে পারলাম না | বললাম জানিস ওই রোগ হলে কি হয় ?"

-"ওই তো মাথা খারাপ হয়ে যায় তো | উল্টোপাল্টা ভুলভাল বকে | দিন না কাকু দুটো টাকা |"

আমি গম্ভীরভাবে বললাম -"নিজের বাপের নাম মিথ্যে বলে ভিক্ষা করতে তো ভালই শিখেছিস | কোথায় শুনেছিস ওই রোগের নাম ? "

এবার সে একটু জড়োসড় ভাবে বলল -"গাড়িতেই একজনের মুখে শুনেছি | এভাবে না বললে কেউ ভিক্ষা দেয় না |"

ছেলেটার প্রতি কেন যেন একটু মায়া হোলো | তাই কথা না বাড়িয়ে পকেট থেকে দু-টাকা বের করে ওকে দিতেই ফুরুত করে পালিয়ে গেলো | ট্রেন ততক্ষণে শিয়ালদা স্টেশনে চোদ্দ নম্বর প্ল্যাটফর্মে ঢুকে গেছে | মনোজ সেই মন্থর গতির ট্রেন থেকেই নেমে সামনের দিকে সরে গেলো |

ট্রেন পুরোপুরিভাবে থামার পর আমি নামলাম | যে কাজের জন্য এসেছি তার জন্য বেশি তারা নেই, তাই লোকজনের পিছনে ধীরেসুস্থে চলতে লাগলাম | চোখে পড়ল প্ল্যাটফর্মের শেষ মাথায় কিছু উত্তেজিত লোকের জটলা | সেখান থেকে বিভিন্ন ধরনের 'শ্রুতিমধুর' গালিগালাজ ভেসে এলো আমার কানে | অনেকেই ব্যাপরটা লক্ষ করেও এড়িয়ে চলে যাচ্ছে | কিন্তু আমি নিজের তাগিদেই জটলার দিকে এগিয়ে গেলাম | যদিও বুঝতে বাকি ছিল না কি ঘটেছে |

জটলার ভিতর মধ্যমনি দুই 'অতিশয় ভদ্রলোক' একটা ছোট ছেলেকে শক্তপোক্ত ভাবে ধরে তাকেই গালমন্দ করছে। এই রকম ক্রুদ্ধ ভদ্রলোকের জিহ্বাস্থানের সাক্ষী আমি আমার পেশার সার্থে বহুবার হয়েছি। বন্দী ছেলেটাকে চিনতে অসুবিধা হলো না ; সে হলো মনোজ। দুই ব্যক্তির নাগপাশে আবদ্ধ হয়ে সে ভেউভেউ করে কেঁদে চলেছে। দুই ব্যক্তির একজন মনোজের দান হাতটাকে নব্বই ডিগ্রী অ্যাঙ্গেলে পিছমোড়া করে রেখেছে। আর অপর মোটাসোটা ভদ্রলোক মনোজের একটা কান প্রায় একশো আশি ডিগ্রী অ্যাঙ্গেলে মোচর দিয়ে ফেলেছে। মনোজ বলছে - "সত্যি বলছি কাকু, আমি নিইনি।"

মোটাসোটা ভদ্রলোক মনোজের কানে আরেকটু চাপ দিয়ে বাঁকা স্বরে বললেন-"আহা !! বড় এলেন রে আমার ভাইয়ের আদুরে ব্যাটা। আমি যেন ওর বহুজন্মের আপন। হুঃ....! শালা, ভালয় ভালয় দিয়ে দে বলছি। নইলে তোর কপালে চরম দুঃখ আছে।"

-"আমি তোমার মানিব্যাগ নিইনি বলছি তো, ছেড়ে দাও না।"

-"উঃ ! ছেড়ে দেব। দাদা আমি বলি কি এই হারামজাদাকে জি.আর.পি তে নিয়ে যাই চলুন। দেবে দুই ডান্ডার বাড়ি, বাপ বাপ বলে মুখ খুলবে।" মনোজের হাত মোচর রাখা দ্বিতীয় ব্যক্তি বলে উঠলেন।

ভিড়ের মধ্যে বেশিরভাগ লোকই চুপচাপ মজা দেখছে। কেউ আবার ফাঁকফোকর দিয়ে ফোড়ন দিয়ে উঠছেন। একমাত্র আমিই ব্যতিক্রম হয়ে মোটা ভদ্রলোকটিকে জিজ্ঞেস করলাম- "ওকে আপনার পার্স চুরি করতে হাতে নাতে ধরেছেন ?"

-"তা নয় তো কি। ট্রেন থেকে নেমে যেই না পিছনের পকেটে হাত দিয়েছি. দেখি পকেট হালকা। আর এও শয়তানের বাচ্চাটা ঠিক সেই সময়েই আমার পাশ কাটিয়ে পালাচ্ছিলো। আমার ভাগ্নিপতি বুঝতে পেরে সঙ্গে সঙ্গে খপ করে ধরেছে।"

-"ও তো বলছে ওর কাছে পার্স নেই।"

-"বললেই হলো। ও-ই নিয়েছে। ওর কাছেই আছে।"

-"আমি নিইনি ...." আরও একবার করুন আর্তি করলো মনোজ।

-"ওকে সার্চ করেছেন আপনারা ?"

লোকদুটো আবারও মনোজ কেই দোষী বলতে যাচ্ছিলো। কিন্তু আমি ছাড়াও ভিড়ের মধ্যে কয়েকজনের কথায় একরকম বাধ্য হয়েই মত ভদ্রলোকের ভাগ্নিপাতি মনোজের বুকে, পিঠে, পেটে চাপড় মেরে প্যান্টের পকেট দেখে নিয়ে হতাশ অথচ অপরাজেয় দৃষ্টিতে তার দাদার দিকে তাকিয়ে বললেই -"নেই"

বললাম-"একে বেকার মারধর করে কিছু পেলেন কি ? পার্শে ইম্পর্টেন্স কিছু থেকে থাকলে জি.আর.পি তে একটা ডায়েরী করে নিন"

-"সে বুদ্ধি আমাদেরও আছে মশাই।" মোটা ভদ্রলোকটির এরকম তির্যক মন্তব্যে কান দেবার কোনো মানে হয় না। পাশ থেকে মনোজ ততক্ষণে আবার হাওয়া হয়েছে। বলাই বাহুল্য; ভীড়ও নেই। কারণ পয়সা দিয়েই হোক আর বিনা পয়সাতেই হোক, সিনেমা শেষ হয়ে যাওয়ার পর কোনো দর্শকের আর পাত্তা পাওয়া যায় না। মোটা ভদ্র লোককে তার সেই বলিষ্ঠ ভাগ্নিপতি আমার পাশ কাটিয়ে যেতে যেতে বললেন - "তাড়াতাড়ি চলুন দাদা। আর দেরি হলে রানাঘাটটা ধরা যাবে না "।

কি অদ্ভুত মানুষ ! এই অল্প সময়ের মধ্যেই মানি ব্যাগের মায়া কাটিয়ে উঠতে পেরেছেন।

আধ ঘন্টার মধ্যে আমি আমার কাজ সেরে আবার শিয়ালদা স্টেশন ফিরে এলাম। চারের "এ" নম্বর প্ল্যাটফর্মের পরে যে পানীয় জলের কল আছে । সেখানে মুখ ধুয়ে জল খাচ্ছি এমন সময় একটা কথোপকথন কানে আসায় সেটা মন দিয়ে শুনলাম। আমার পিছনে কিছুদূরে কথা চলছিলো দুই বন্ধুর মধ্যে। একজন কথা বলছে আধা বাংলা আধা হিন্দি ভাষায়। আর একজন কণ্ঠসর আমার চেনা টা বলছে

- " আল্লাহ কসম ইয়ার মনোজ, আজ আমার মন করছিল কি উ শালা মোটাকে আধলা মেরে শির ফোড়ে দিই।"
- " ওসব ছাড়। মোটার মানিব্যাগটা কোথায়? ঠিক ঠাক রেখেছিস তো?"
- "আরে ইয়ার ! আমার কাছে দিয়েছিস তো ঠিকঠাকই রাখব। আভি তক উও দশ রুপিয়াকে লিয়ে আমাকে বিসওয়াস করিস না। ঠিক হ্যায়, আজ তু দশ টাকা বেশি রেখে লে।"
- "ব্যাগটা খুলেছিস? কত মাল আছে?"
- "যখুন আমার হাতে পাচার করলি তখুনই দেখে লিয়েছি। বেশি মাল নেই। লেকিন ইয়ার; তোকে যখুন ওরা পাকড়ে নিলো আমি তো ডরিয়েই গেলাম।"
- "শালা জানোয়ার ! মুখে লাথি মারবো তোর। কোনায় দাড়িয়ে হাসছিলি আমি যেন আর দেখিনি।"

  অন্য ছেলেটা হেসে উঠল।

- "হাসিস না। তারাতারি চল। মালটা কিনে আনি। কাল নেশাটা ঠিকঠাক জমেনি।"
- "এখুন কিসের দরকার। রাতের আগে খরিদ লেবো। আমার কাছে কালকের আধা টিউব আভি ভি আছে। তুই লিয়ে নিস।"

মনোজ আর তার বন্ধু যে কোন টিউবের কথা বলছে তা আমার জানার বাকি নেই। ওদের কথা শুনে অবাক ও হলাম না। কেন না এটাই বাস্তব। এর আগেও এরম ছেলেদের দেখেছি। যারা ক্ষুধার তাড়নায় ভিক্ষা করেনা। অন্নসংস্থানের জন্য পকেট কাটে না। এদের চাহিদা বিভিন্ন সস্তা ক্যেমিক্যাল প্রোডাক্ট থেকে নেশার রসদ জোগাড় করা। এক মুঠো ভাতের চেয়েও এ জিনিস ওদের কাছে মহা মূল্যবান। রাত বাড়লেই ফাঁকা ষ্টেশন চত্বর বা রেল সাবওয়ের নিরাপদ আস্তানায় অচেতন হয়ে লুটিয়ে পরে থাকে এরা।

দুই বন্ধু আমার দিকে পেছন ফিরে কথা বলছিল। সেই সুযোগে চুপিসাড়ে গিয়ে আচমকা ওদের ঘাড় চেপে ধরলাম। ওরাও থতমত খেয়ে গেল। বললাম- "পকেট কেটে নেশা করা ঘোচাচ্ছি তোদের। এবার চল জি.আর.পি তে।"

মনোজ বলল- "না কাকু। ছেড়ে দাও। ওরা বহুত মার মারবে।"

"বেশ হবে। তোদের মার খাওয়াই উচিত।"

মনোজ হঠাৎ আমার হাতের ফাঁক দিয়ে পিছনে উঁকি দিয়ে শঙ্কিত ভাবে বলল- "পুলিশ আসছে, পালা..."

আমিও হটাৎ পেছনে তাকাতেই ওরা দুইজন আমাকে ধাক্কা দিয়ে দৌড় দিলো। আমার পেছনে কোনও পুলিশই নেই। তার মানে মনোজ আবারো আমাকে ফাঁকি দিয়ে গেলো। সামনে তাকিয়ে দেখলাম, ব্যস্ততম রেল ষ্টেশনের যাত্রীদের ভীড়ের মাঝে খালি পায়ে দৌড়ে যাচ্ছে ভারতবর্ষের দুই ভবিষ্যৎ। লাগামহীন তাদের জীবন। চোখের নিমেষে নেশার রসাস্বাদনের বাসনায় মরিয়া দুই কিশোর জনঅরন্যে হারিয়ে গেল। হঠাৎ খেয়াল হওয়ায় নিজের প্যান্টের পেছনের পকেটে হাত দিলাম। নাঃ, আমার মানিব্যাগ ঠিকই আছে। অফ ডিউটি হলেও আমি নিজেই যে একজন পুলিশকর্মী তা আশেপাশের কেউ বোঝেনি ভাগ্যিস। নইলে আর লজ্জার সীমা থাকত না।♦

একটা আর্জি... ফেলুদার কাছে

স্বাতী চ্যাটার্জ্জী ভৌমিক

আমার একটা ছোট্ট ভাই আছে...
জানো ফেলুদা... নাম ওর যাই হোক
আমি ওকে তোপসে বলি...
তুমি ওর শয়নে স্বপনে জাগরণে,
সবসময় রয়েছো।
সেই যে তুমি রাজস্থান গেলে
বর্মন আর বোসের সন্ধানে,
ঘুরলে বিকানের, যোধপুর, জয়সলমের
তখনতো ও তোমার সাথেই ছিল
মনে মনে ঘুরেছে তোমার সাথে,
রেললাইন খুঁজতে বালির মধ্যে দৌড়েছে,
বিছানায় বিছে দেখে লাফিয়ে উঠেছে,
জটায়ুর কান্ড দেখে হেসে খুন হয়েছে...
সে তো আমার ওই ছোট্ট ভাইটাই।
ওকে তুমি সঙ্গে নেবে ফেলুদা? পরের বার?
সেই যে বার তুমি বেনারস গেলে,
মগনলাল কে জব্দ করলে...
সে বারেও... কাশীর ঘাটে মছলিবাবা দর্শন থেকে ,
মগনলালের ডেরায় হেনস্থা হওয়া অবধি
সবসময় ও তোমার সাথে ছিল,
ওই তো বাঁচালো তোমায়,
ঘুলঘুলির পিস্তল থেকে...
লালমোহনের বন্ধু তো তুমি একা নও
তোপসেও তো, তাই নয় কি?
ওকে তুমি সঙ্গে নাও না ফেলুদা...
তোমার তোপসে তো নিশ্চয়ই এতদিনে সাবালক,
চাকরিও পেয়েছে শুনলাম সেক্টর ফাইভে...
ওর কি আর সময় আছে তোমার সাথে অ্যাডভেঞ্চারে যাওয়ার?
তার চেয়ে আমার এই ভাইটাকে
সাথে নাও তুমি...
এরপর যখন তুমি গুজরাট কিংবা
হায়দ্রাবাদ যাবে ... কিংবা ইজিপ্ট,
হয়তবা সিঙ্গাপুরেও...কিংবা ব্রাজিল!
ও তোমার সাথে থাকবে,
তোমার সবকথা শুনবে...
আর তোমাকেও আগলে রাখবে...
নেবে সাথে? ও ফেলুদা! বলো না...
আমরা তো সবাই মনে মনে ফেলুদা
বা তোপসে... সেই ছোটবেলা থেকেই ...
সবাই বলে ফেলুদা কেন সত্যি হলোনা!
আমি বলি তুমি কল্পনাতেই ভালো
সত্যি হলে এই অনাবিল ভালো লাগাটা
থাকতো না আর...
আমার এই ভাইটার মতো আরো কত তোপসে আছে ঘরে ঘরে
তোমার ডাকের অপেক্ষায়...
ফেলুদা তুমি ফিরে এসো,
ডেকে নাও তোমার তোপসেকে... আসবে?
বলো না ফেলুদা... ও ফেলুদা !

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

তারপর অরণ্য, অরণ্য- সুন্দর অপূর্ব ঘন নির্জন অরণ্য! পূর্বেই বলিয়াছি এ-জঙ্গলে মাথার উপরে গাছপালার ডালে ডালে জড়াজড়ি নাই- কেঁদচারা, শালচারা, পলাশ, মহুয়া, কুলের অরণ্য- প্রস্তরাকীর্ণ রাঙা মাটির ডাঙা, উঁচু-নিচু। মাঝে মাঝে মাটির উপর বন্য হস্তীর পদচিহ্ন। মানুষজন নাই।

চিত্রগ্রাহক : চিরঞ্জীৎ দাস

জনপ্রিয় বাঙালি কথাসাহিত্যিক বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় এর পৈতৃক নিবাস উত্তর ২৪ পরগণা জেলার বারাকপুর গ্রাম

চিত্রগ্রাহক : চিরঞ্জীৎ দাস

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় এর নিবাস
বিহার (বর্তমানে ঝাড়খন্ড) ঘাটশিলা

চিত্রগ্রাহক : চিরঞ্জীৎ দাস

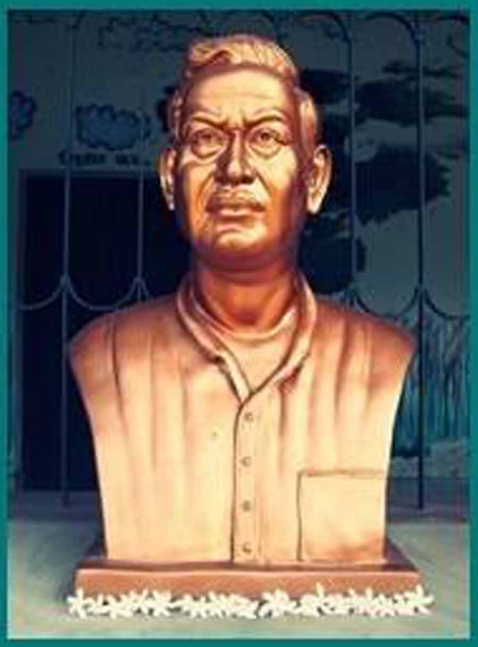

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় এর লিখিত জনপ্রিয় উপন্যাস আদর্শ হিন্দু হোটেল
যে হোটেল কে ঘিরে ১৯৪০ সালে এই উপন্যাস লেখা হয়
তা আজও একই জায়গায় অবস্থিত

চিত্রগ্রাহক : চিরঞ্জীৎ দাস

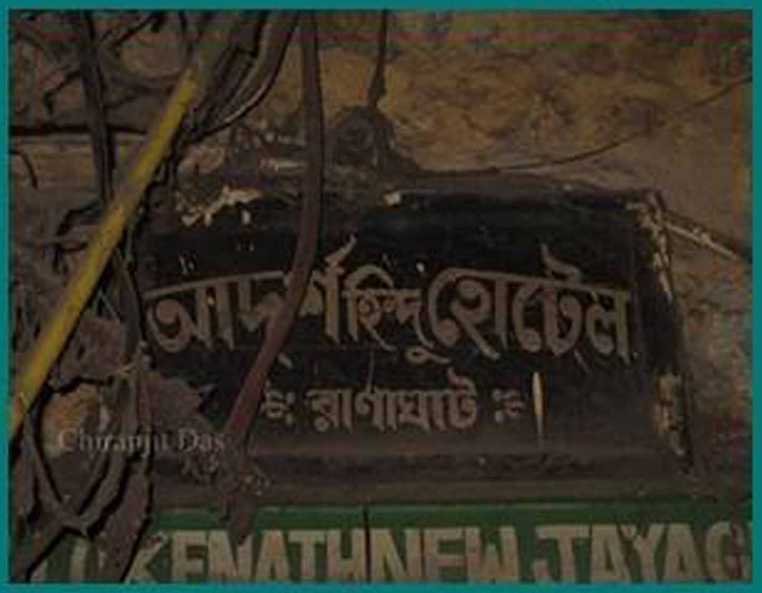

আমরা ও ফেলুদা

দীপান্বিতা ভট্টাচার্য

ফেলুদার অ্যাডভেঞ্চার আর রহস্য উদঘাটন
ছোটোবেলায় গোয়েন্দা গল্প পড়ার ছিল অন্যতম আকর্ষণ।
তোপশের হাত ধরে ফেলুদার সব রহস্য সমাধানের সঙ্গী আমরা সবাই,
গিয়েছি কত জায়গায়, যেমন কাঠমান্ডু , বারাণসী, গ্যাংটক, রাজস্থান, মুম্বাই।
গল্প পড়ার সময় সর্বদা নিজেদের দেখেছি তোপশের স্থানে,
সবুজ অ্যাম্বাসাডরে বেড়িয়েছি ফেলুদা, আমরা আর জটায়ু মধ্যিখানে।
জটায়ুর লেখা গল্পের নামগুলো যতই হোক ভয়ানক আর বিদ্‌ঘুটে,
সেগুলো অন্তত একবার পড়ার উৎসাহ আমাদের সকলেরই ছিল বটে।
শুধু তাই নয়, ফেলুদার থেকে কত বিবিধ বিষয়ে পেয়েছি আমরা জ্ঞান,
তা আমরা আজও ভুলিনি, স্মৃতিতে সদা বিরাজমান।
সিধুজ্যাঠার সেই অসাধারণ সংগ্রহ অনুপ্রেরণা দিয়েছে অনবরত,
মানুষের অপরিসীম জ্ঞান আর স্মৃতিশক্তির যেন এক দৃষ্টান্ত।
ফেলুদার কাছে আমরা শিখেছি ধৈর্য আর হাল না ছাড়ার শিক্ষা,
যা সাহায্য করেছে আমাদের উত্তীর্ণ হতে জীবনের বহু পরীক্ষা।
আজ আমরা বড় হয়েছি একথা যেমন সত্যি,
কিন্তু ফেলুদা কাহিনীর প্রতি উৎসাহ ও অনুরাগ কমেনি এক রত্তি।
মগনলাল মেঘরাজের প্রতি আমাদের আজও বিরূপ মনোভাব,
এমনই ছিল এবং আছে আমাদের উপর ফেলুদা গল্পের প্রভাব।
আজও ছোটরা অনেকে হয়ত প্রথম শুরু করেছে ফেলুদার গল্প পড়তে,
এভাবেই ফেলুদা, তোপসে আর জটায়ু চিরকাল থেকে যাবে আমাদের মধ্যে।
জীবনের সুখে দুখে সাফল্য পরাজয়ে ফেলুদাকে পেয়েছি আমরা পাশে,
আর ফেলুদাই আজ আমাদের একত্রিত করেছে FFC তে জাতি – ধর্ম – বর্ণ নির্বিশেষে।
ফেলুদা তোমাকে আমাদের শ্রদ্ধা জানাই, জানাই অনেক সেলাম,
আর ফেলুদার স্রষ্টা সত্যজিৎ রায়কে আমাদের শতকোটি প্রণাম।

সে অনেক আগের কথা। আমি তখন মুম্বাই –এর ভি. জে. টি. আই. তে ইঞ্জিনিয়ারিং-এর ছাত্র। আমাদের প্রথম সেমিস্টারের পরীক্ষা হয়ে গেছে। পরের দিন থেকে কলেজ ও হস্টেল বন্ধ হয়ে যাবে কিছুদিনের জন্য। আমরাও নিজের নিজের বাড়ি যাব।

সেদিন সন্ধ্যায় হস্টেলে বসে আড্ডা দিতে দিতে হঠাৎ উঠল ভূতের প্রসঙ্গ। আমরা সবাই বিজ্ঞান ও ইঞ্জিনিয়ারিং-এর ছাত্র। তাই প্রায় সবাই জোর গলায় বলল যে ভূত প্রেত বলে কিছু হয় না। সবই মনের ভুল। আমি সবার কথা শুনছিলাম কিন্তু কোনও মন্তব্য করিনি।

আমার রুম পার্টনার ছিল সুনীল আগরওয়াল। সুনীল আর আমি দুজনেই দিল্লি থেকে পড়তে গিয়েছিলাম। তাই আমাদের দুজনের বন্ধুত্ব হয়ে গিয়েছিল খুব তাড়াতাড়ি। সুনীলও চুপচাপ ছিল। আমাদের এক সহপাঠী রাকেশ মুম্বাই-এর ছেলে। সে হঠাৎ সুনীলকে বলল, "কিরে চুপচাপ কেন তুই? তোর এই ব্যাপারে কি মতামত বলনা।"

সুনীল খানিক্ষণ চুপ করে রইল। তারপর বলল, "ভাই তোমরা সব বন্ধু মানুষ। তোমাদের কাছে স্বীকার করতে লজ্জা নেই যে আমি কিন্তু ভূত প্রেত মানি। আর আমাদের ফ্যামিলিরও কিছু এমন অভিজ্ঞতা হয়েছে যে আমি অলৌকিক ব্যাপারটাকে অস্বীকার করতে পারি না।"

এই কথা বলতেই সবাই হৈ হৈ করে উঠল, "বলিস কি রে ব্যাটা ? আর কয়েক বছর বাদে ইঞ্জিনিয়ার হয়ে বেরোবি আর তুই কিনা ভূতে বিশ্বাস করিস !"

ফের তর্কাতর্কি শুরু হতে যাচ্ছিল। আমি সুনীলকে বললাম , "দেখ তুই যখন ভূত প্রেত মানিস তখন নিশ্চয়ই তার কোনও কারণ আছে। কিন্তু কারণটা কি ? তুই কি ভূত প্রেত নিজের চোখে দেখেছিস কখনও ?"

"না না আমি নিজে ভূত প্রেত কখনও দেখিনি। তবে আমাদের গ্রামের কাছে..."

কয়েকজন ফের হৈ চৈ করে উঠল, "তোর গ্রামের কথা শুনতে চাই না। তুই ভূত দেখেছিস কিনা তাই বল।"

এরপর সুনীলের কাছ থেকে যা শোনা গেল তা এই -----

সুনীলের বাবা দিল্লিতে সরকারি চাকরি করেন। তাই ওরও বেশির ভাগ সময় কাটে দিল্লিতে। কিন্তু ওদের পৈত্রিক বাড়ি হলো উত্তর প্রদেশের (তখনও উত্তরাখন্ড হয়নি) বিখ্যাত টুরিস্ট স্পট দেরাদুন থেকে খানিকটা দূরে একটা গ্রামে। গ্রামের নাম নূতনগড়। এই গ্রামের বাড়িতে ওর দাদু ও ঠাকুমা থাকেন। এক সময় দেরাদুন ও তার কাছাকাছি অনেক সাহেবসুবোরা থাকত ব্রিটিশ আমলে।

নূতনগড়ের বাইরে একটা পুরনো সাহেবি কবরখানা আছে । সেখানে সাহেবদের কেউ মারা গেলে সমাধি দেওয়া হতো। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় নূতনগড়ের কাছাকাছি নাকি একটা মিলিটারি ক্যাম্প ছিল। এক রাতে নাকি সেই ক্যাম্পে হঠাৎ আগুন ধরে যায় ও অনেক লোক তাতে প্রাণ হারায়। তাদের সবাইকে ওই কবরখানাতেই কবর দেওয়া হয়।

আর তারপর থেকেই ওই কবরখানা সম্বন্ধে নানা রকম গুজব ছড়াতে শুরু করে। নূতনগড়ের লোকেরা ওই কবরখানাকে এড়িয়ে যেতে শুরু করে। রাত বিরেতে ওর পাশ দিয়ে আসতে গিয়ে অনেকে নাকি নানারকম অদ্ভুত জিনিষ দেখেছে । কেউ দেখেছে যে কবরখানার মধ্যে আগুন জ্বলছে কোথাও, কেউ বা নাকি দেখেছে যে ছায়ারা ঘুরে বেরাচ্ছে ও আরও কত কি।

ওই অগ্নিকান্ডে যারা মারা গিয়েছিল, তাদের ওখানে কবর দেবার পর ওই কবরখানাটা পরিত্যক্ত হয়। কেননা তার কিছুদিন বাদে এ দেশ স্বাধীন হয়। সাহেবরা ভারত ছেড়ে চলে যায় । ওই কবরখানা দেখভাল করার জন্য একজন সরকারি চৌকিদার আছে। তবে সেও কবরখানার মধ্যে থাকে না। ওখান থেকে একটু দূরে থাকে।

এত কথা বলার পর সুনীল একটু থামে। আবার শুরু হয় হট্টগোল ---

"আরে ওইরকম গপ্পো অনেক শুনেছি রে। ওইরকম কবরখানা ভারতের নানা জায়গাতেই আছে। কিন্তু তার সাথে তোর ভূতে বিশ্বাস করার সম্বন্ধ কি রে ?"

(২)

সুনীল বরাবরই খুব ধীরস্থির। শান্তভাবে বলে, "আমাকে শেষ করতে দে আগে। ১৯৪৭ সালের কথা। দেশ তখন সবে স্বাধীন হয়েছে। আমার দাদু ছিলেন সরকারি চাকুরে। তিনি তখন একবার ছুটিতে নূতনগড় এসেছেন। একদিন ঘুরতে ঘুরতে গিয়ে পড়লেন সেই কবরখানার কাছে। ভেতরে ঢুকে দেখলেন যে বড় বড় ঝোপঝাপ আর ঘাসে পুরো জায়গাটা ভর্তি। তাই দেখে ওনার কেন যেন খুব খারাপ লাগে।"

তার পরের দিন নিজেই টাকা খরচ করে কিছু কুলিমজুর ডেকে সব ঝোপ ঘাস কাটিয়ে পুরো কবরখানা পরিষ্কার করতে শুরু করেন ও কবরখানার শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত যাবার জন্য যে সরু রাস্তাটা ছিল সেটাও লাল সুরকি ফেলে মেরামত শুরু করেন।

এই কাজ যখন চলছে তখন একদিন দুপুরবেলা কুলি মজুরদের কাজ বুঝিয়ে দিয়ে বাড়ি ফিরবেন বলে কবরখানা থেকে বেড়িয়ে কয়েক পা হেঁটে এসেছেন এমন সময় হঠাৎ দেখেন যে একজন পাদ্রিদের মতো সাদা আলখাল্লা পরা লম্বা ও বৃদ্ধ মানুষ কবরখানার দিকে এগিয়ে আসছেন। তিনি কাছে আসতেই স্বাভাবিক সৌজন্যতাবশত আমার দাদু তাকে নমস্কার করলেন।

বৃদ্ধ মানুষটিও প্রতিনমস্কার করে বললেন, "আপনি কি ওই কবরখানা থেকে আসছেন এই দুপুরবেলা ? কিন্তু এই সময় আপনি ওখানে কেন গিয়েছিলেন ? আপনি কি জানেন না যারা চিরনিদ্রায় নিদ্রিত তাদের বিরক্ত করা ঠিক না ?"

তখন দাদু পুরো ব্যাপারটা খুলে বললেন। তাই শুনে সেই পাদ্রির মতো দেখতে মানুষটি খুব খুশি হয়েছিলেন ও বলেছিলেন, "আপনি খ্রিস্টান না হয়েও এই সমাধিভূমিকে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করেছেন । আমি আপনাকে আশীর্বাদ করছি যে আপনি জীবনে অনেক উন্নতি করবেন। আপনার পরিবার ও বংশের কেউ কখনও কোনও বড় বিপদ আপদের মধ্যে পড়বেন না। আপনার কল্যাণ হবে। তবে আমার একটা অনুরোধ যদি রাখেন তাহলে বড় ভালো হয় । প্রত্যেক বছর বর্ষাকালের পর এই কবরখানাটি যদি একটু পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করে দেন তাহলে ভালো হয় । আরও একটা কথা আপনাকে বলে রাখি। আপনি গ্রামের মানুষদের মানা করে দেবেন যে তারা যেন কেউ কৌতূহলী হয়ে যখন তখন এখানে এসে চিরনিদ্রায় নিদ্রিতদের বিশ্রামে ব্যাঘাত না ঘটায়। তেমন করলে তার ফল ভালো নাও হতে পারে। তবে আপনি ও আপনার পরিবারের সবাই এখানে ইচ্ছা মতো আসতে পারেন। আমার আশীর্বাদ আপনার পরিবারের সাথে সবসময় থাকবে।"

এইসব কথা শুনতে শুনতে আমার দাদু কেমন যেন বিহ্বল হয়ে গিয়েছিলেন । হঠাৎ খেয়াল হতেই দেখেন যে সেই পাদ্রির মতো মানুষটি আর তার সামনে নেই। পেছন ফিরে দেখেন যে পেছনেও ৫০-৬০ গজ দূরে কবরখানার ফটক দেখা যাচ্ছে। পাদ্রি কি কবরখানাতেই গেলেন নাকি? এই কথা ভেবে আমার দাদু আবার কবরখানাতে ফিরে গেলেন । দেখলেন যে কুলিমজুররা নিজের নিজের কাজে ব্যস্ত । তারা ছাড়া আর কেউ সেখানে নেই। দাদু পুরো কবরখানা ঘুরে দেখলেন। কুলিদের জিজ্ঞাসা করলেন যে তারা কোনও পাদ্রিকে ঢুকতে দেখেছে কিনা ? কিন্তু সবাই বলল যে তারা কাউকে ঢুকতে দেখেনি।

কয়েকজন বলে ওঠে, "এ তো অদ্ভুত ব্যাপার রে ! লোকটা গায়েব হয়ে গেল কোথায় ? এ তো আর শহরের রাস্তা নয় যে ঝট করে কেউ ভিড়ের মাঝে অদৃশ্য হয়ে যাবে !"

এইসময় রাকেশ আবার হেসে ওঠে। "তোরা দেখছি সাইন্সের স্টুডেন্ট হয়েও ব্যাপারটা বুঝতে পারছিস না। ওই সময় সুনীলের দাদুর হ্যালুসিনেসান হয়েছিল । তিনি কোনও কারণে ভুল দেখেছিলেন । হয়তো তিনি এই ব্যাপারটা নিয়ে খুব বেশি ভেবেছিলেন , তাই ওর ওইরকম ভ্রম হয়েছিল।"

সুনীল এবার হেসে ফেলে তারপর বলে, "কিন্তু আসল মজাটা শুরু হল তারপর । দাদুর চাকরিতে খুব তাড়াতাড়ি প্রমোশান হতে শুরু করল । সরকারি চাকরিতে সাধারণত ওই ভাবে অত তাড়াতাড়ি প্রমোশান হয় না। সাধারণভাবে প্রমোশান হলে হয়তো দাদু ডেপুটি সেক্রেটারি হয়ে রিটায়ার করতেন। কিন্তু দাদু রিটায়ার করেন উত্তর প্রদেশের চিফ সেক্রেটারী হয়ে। এটা যে হতে পারে তা তিনি নিজে কখনও ভাবেননি। কিন্তু এখনও আমার দাদু নিয়মিত বর্ষাকালের পর সেই কবরখানা লোক লাগিয়ে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করে দেন । সুরকি ঢালিয়ে ভেতরের রাস্তাটা ভালো করে দেন । আমার বাবাকেও এই ব্যাপারে বলে রেখেছেন যে তার পরে বাবাকেও এটা চালিয়ে যেতে হবে। আমিও দাদুর সাথে ওই কবরখানায় কয়েকবার গিয়েছি । আর প্রত্যেকবারই আমার একটা খুব অদ্ভুত ফিলিং হয়েছে । সেটা ঠিক ভয়ের ফিলিং না একটা অদ্ভুত অনুভূতি সেটা তোদের বলে বোঝাতে পারব না। "

আমরা মনোযোগ দিয়ে সুনীলের কথা শুনছিলাম। আবারও রাকেশ বলে ওঠে, "আমি কিন্তু মোটেই অবাক হচ্ছি না তোর কথা শুনে। আরে ব্রিটিশরা ভারত ছেড়ে চলে যাবার পর সরকারি চাকরির অনেক পোষ্ট ভ্যাক্যান্ট হয়ে গিয়েছিল । তাই ওই সময় অনেকের খুব তাড়াতাড়ি চাকরিতে প্রমোশান হয়েছে। আর তুই তোর দাদুর কাছ থেকে এই সব কথা শুনেছিলি বলে ওখানে গিয়ে তোর ওই সব তথাকথিত অদ্ভুত অনুভূতি হয়েছিল । এতো সিম্পল ব্যাপার।"

কথায় কথায় রাত হয়ে গিয়েছিল । পরদিন থেকে আবার সবার বাড়ি ফেরার তাড়া। তাই আমাদের সভা ভঙ্গ করতে হল। রুমে ফিরে এসে আমি বললাম, "হ্যাঁ রে সুনীল, যা বললি তা কি সব ঠিক না কি মজা করার জন্যে বললি ?"

"আমার জ্ঞান বুদ্ধি মতো সবই ঠিক বলেছি। এখন বিশ্বাস করা না করা তোর ইচ্ছা। চল শুয়ে পড়ি, কাল আবার ট্রেন ধরতে হবে।"

এমন সময় দরজায় টোকা শোনা গেল। দরজা খুলে দেখি যে রাকেশ দাঁড়িয়ে আছে। ভেতরে এসে বলল। "সুনীল, তোর কথা শুনে আমার ঐ কবরখানা দেখতে ইচ্ছে করছে। আমাকে দেখাতে পারবি ?"

"হ্যাঁ, কেন পারব না ? কিন্তু তাহলে তো তোকে আমাদের সাথে যেতে হবে।"

"আমিও ভাবছি যে তোদের সাথে ঘুরে আসি। আর কিছু না হোক, দিল্লি আর দেরাদুনটা ঘোরা হাবে। আর এখানে ছুটিতে বাড়িতে বসে থেকেই বা আর কি করব।"

সুনীল বলল, "ঠিক আছে চল তাহলে। আমাদের তো কালকেই ট্রেন। তুইও চল। দিল্লিতে দুদিন থেকে তারপর দেরাদুন চলে যাব। আমারও দাদু ঠাকুমার সাথে প্রায় তিন বছর দেখা হয়নি। সেই ক্লাস টেনের পরীক্ষা দিয়ে গিয়েছিলাম। তারপর ক্লাস ইলাভেন ও টুয়েলভ-এর পড়াশোনার চাপ সামলে ও ইঞ্জিনিয়ারিং-এর এন্ট্রান্স পরীক্ষা দেওয়া, ভরতি হওয়া এসব ঝামেলাতে আর যেতে পারিনি। তাই ভাবছিলাম যে এবার ছুটিতে গিয়ে গ্রামে যাব।"

তারপর আমার দিকে তাকিয়ে বলে, " সুধীর, রাকেশ যাচ্ছে যখন তখন তুইও চল না আমাদের গ্রাম ঘুরে আসবি।"

(৩)

দিল্লি থেকে বাসে আমরা দেরাদুন পৌঁছলাম সকালবেলা। রাতে বাস ধরেছিলাম।বাস স্ট্যান্ডে সুনীলের দাদু নিজে এসেছিলেন গাড়ি নিয়ে। দেরাদুন থেকে আরও ঘন্টাখানেকের রাস্তা। আমাদের দেখে খুব খুশি হলেন সুনীলের দাদু।

"খুব খুশি হলাম তোমাদের দেখে। এসেছ যখন তখন থাক কিছুদিন। আশেপাশে অনেক টুরিস্ট স্পট আছে। সব ঘুরে দেখ।"

সুনীল বলে, "না দাদাজি, ওরা খুব বেশিদিন থাকতে পারবে না। রাকেশকে বম্বে ফিরতে হবে আর সুধীরকেও কিছুদিন দিল্লিতে থাকতে হবে ওর মা বাবার কাছে। এর পর আবার নতুন সেমিস্টার শুরু হয়ে গেলে তখন তো আর ও দিল্লি আসতে পারবে না। তবে আমি এই ছুটিটা তোমাদের সাথে থাকব।"

দুপুরে খাওয়াদাওয়ার পর সুনীলও বলল, "চল তোদের একবার দিনের বেলা ওখান থেকে ঘুরিয়ে আনি আর অ্যান্টনি চাচার সাথেও আলাপ করিয়ে দি। অ্যান্টনি চাচা হল ওই কবরখানার সরকারি চৌকিদার। অনেকদিন ধরে এখানে চাকরি করছেন।

আমরা বেরিয়ে পরি। বাড়ি থেকে প্রায় মিনিট ২০-২৫ এর হাঁটা পথ। গ্রামের একেবারে প্রান্তে কবরখানা। চুপচাপ নিস্তব্ধ জায়গা। লোকজন আশেপাশে কেউ কোথাও নেই। চার পাশে অনেক বড় বড় গাছ।

কবরখানার ভারী লোহার গেটে একটা বড় তালা লাগানো। সুনীল বলল, "এই তালার একটা চাবি আছে আমার দাদুর কাছে আর একটা চাবি আছে অ্যান্টনি চাচার কাছে। চল একবার ওনার সাথেও দেখা করে আসি। উনি একটু দূরে থাকেন।"

কবরখানার গেটে একটা সাইনবোর্ড লাগানো। তাতে লেখা ---

Nutangarh Christian Cemetry
(1900 – 1945)
Entry without permission is strictly prohibited.
Tresspassers will be prosecuted

By Order.

District Collector – Dehradun

ওখান থেকে খানিকটা দূরে দুটো পাকা ঘর। দরজা বন্ধ। সুনীল ডাক দেয়, "অ্যান্টনি চাচা ... জারা বাহার আইয়ে ..."

দুবার ডাকার পরও কেউ বাইরে আসে না। সুনীল বলে, "বুড়ো মানুষ। হয়তো ঘুমিয়ে পরেছেন। চাচার আর কেউ নেই। প্রায় সারাটা জীবনই কাটীয়ে দিল এখানে। দাদুকে খুব শ্রদ্ধা করে বুড়ো। আমাকেও খুব স্নেহ করে।" এই বলে আবার 'চাচা চাচা' বলে ডাক দেয়।

এইবার ঘরের দরজাটা খুলে যায় আর একজন বুড়ো মানুষ বেরিয়ে আসেন। রোগা লম্বা কোল কুঁজো মারকা চেহারা। মুখে বেশ কয়েকদিনের দাড়ি।

এগিয়ে যায় সুনীল, " চাচা, ম্যায় সুনীল। ক্যায়সে হ্যায় আপ ?"

বুড়ো এবার ধীরে ধীরে বলে, "আরে সুনীল তুই ! কবে এলি তুই বেটা ? অনেকদিন পর এলি এবার।"

"হ্যাঁ চাচা, তিন বছর পরে এলাম। কি করব বল, পড়াশুনার খুব চাপ। এই নাও চাচা, তোমার জন্য বম্বে থেকে শার্ট প্যান্ট নিয়ে এসেছি। তুমি পর।" এই বলে সুনীল বুড়োকে একটা বড় প্যাকেট ধরিয়ে দেয়।

বুড়ো প্যাকেটটা হাতে নিয়ে বিড় বিড় করে কি যেন বলে। তারপর সুনীলের মাথায় হাত বোলাতে বোলাতে বলে, "চাচাকে মনে আছে তোর ?"

"সে কি চাচা ! ছোটোবেলা থেকে তোমাকে দেখেছি আর তোমাকে ভুলে যাব কি করে ?"

"খুব ভাল করেছিস যে এবার এলি। তোর সাথে দেখা হয়ে গেল ভালোই হল। কবে আছি কবে নেই। বয়স তো হয়ে গেল অনেক "

"ধুর চাচা! কি সব বাজে কথা বল তুমি। এখনও অনেক বছর বাঁচবে তুমি।" এরপর আমাদের সাথেও পরিচয় করিয়ে দেয়।

"চাচা এই আমার দুই বন্ধু সুধীর আর রাকেশ। ওরা গ্রাম দেখতে এসেছে।"

" খুব ভাল, খুব ভাল।"

"আচ্ছা চাচা একটা কথা বলি। তুমি রাগ করবে না তো ? ওরা একটু সিমেট্রিটা ঘুরে দেখতে চায়। তুমি একটু চল না। আমাদের একটু ঘুরিয়ে দেখিয়ে দেবে।"

এই কথা শুনে বুড়ো যেন একটু ইতস্তত করে। তারপর বলে, "আচ্ছা চল... এখন তো দিনের বেলা... দাঁড়া চাবিটা নিয়ে আসি।"

(৪)

তালা খুলে গেটে ধাক্কা দেন অ্যান্টনি চাচা। আমরা ভেতরে ঢুকি। লাল সুরকি ধালা পথ চলে গেছে ভেতরে। রাস্তার পাশে দু' তিন সারিতে কবর। রাস্তা ও কবরের সারি চলে গেছে অনেক দূর পর্যন্ত। আমরা ধীরে ধীরে সুরকি ঢালা পথ দিয়ে এগিয়ে চলি।

চাচার সাথে কথা বলতে বলতে অনেক কিছু জানতে পারি। এই কবরখানাতে প্রথম কবর দেওয়া হয় ১৯০০ সালে। তখন আশেপাশে অনেক সাহেব সুবোরা থাকত। কাঠের বাড়িতে। সে সব ভাঙ্গাচোরা বাড়ি এখনও নূতনগড়ের আশেপাশে দেখা যায়। অ্যান্টনি চাচার জন্মও এখানেই ১৯১৯-এ। ১৯৩৯ এ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের শুরুতে এখানে একটা বিরাট ব্রিটিশ আর্মি ক্যাম্প স্থাপিত হয়। তখন অ্যান্টনি চাচার বয়স ২০ বছর। চাচা ও ওনার বাবা দুজনেই চাকরি পেলেন আর্মি ক্যাম্পে। থাকতেও হতো আর্মি ক্যাম্পেই।

বেশ কাটছিল দিন। কিন্তু ১৯৪৫-এ যুদ্ধ প্রায় শেষ হবার মুখে হঠাৎই ক্যাম্পে একদিন ভীষণ অগ্নিকান্ড হয়। তাতে অনেকেই পুড়ে মারা যান। অ্যান্টনি চাচার মা ও বাবাও সেই অগ্নিকান্ডের স্বীকার হন। শুধু অ্যান্টনি চাচা সেদিন কোনও কাজে বাইরে গিয়েছিলেন বলে তিনি প্রাণে বেঁচে যান। সেই অগ্নিকান্ডে মৃত সবাইকে কবর দেওয়া হয় এই কবরখানাতে। তারপর

ভারত স্বাধীন হয়। আশেপাশের সব সাহেবরা ভারত ছেড়ে চলে যান ও এই কবরখানাটা পরিত্যক্ত হয়।

অবশ্য এখানে আর নতুন সমাধি দেবার জায়গা ছিল না। এতগুলো অপঘাতে মৃত্যুর শিকার মানুষকে এখানে কবর দেবার জন্য জায়গাটার বদনাম হয়ে যায়।

আগরওয়ালজী (সুনীলের দাদু) –র অনেক দয়া। তিনিই ধরাধরি করে অ্যান্টনি চাচাকে এই কবরখানার চৌকিদারের সরকারি চাকরিটা পাইয়ে দেন। তাও হয়ে গেল অনেক দিন। চাচা রিটায়ার করে গেছেন ১৯৮০ তে। কিন্তু এখানে কেউ চাকরি নিয়ে আসতে চায় না। তাই সরকারের তরফ থেকে তাকে এক্সটেনশান দেওয়া হয়েছে। অবশ্য তার পেছনেও আগরওয়ালজীর অনেক ধরাধরি আছে। নিজের কর্তব্য তিনি সবসময় মন দিয়ে করছেন। আর বাঁচবারও বিশেষ ইচ্ছা নেই। জেসাস তাকে এবার নিজের কাছে ডেকে নিলে পারেন।

আমরা ঘুরতে ঘুরতে দেখছিলাম। অনেকখানি জায়গা নিয়ে কবরখানা। পুরোটা পাঁচিল দিয়ে ঘেরা। ভেতরে অনেক গাছপালা। অনেক জায়গাতেই বেশ বড় বড় ঘাস ও ঝোপঝাড় হয়েছে... জায়গাটা যেন আশ্চর্য রকমের চুপচাপ।

এই সময় চাচা আবার বলেন, "আর মাস দেড়েক পর বর্ষাকালটা শেষ হয়ে গেলেই ঘাস ও ঝোপঝাড় কেটে ফেলে সব আবার পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করা হবে। সবই আগরওয়ালজী করান। উত্তর প্রদেশ সরকার এর পেছনে কোনও টাকা খরচ করে না। এমন কি এই যে কবরখানার পাঁচিল ও লোহার গেট, এই সবই আগরোয়ালজী নিজের টাকায় করিয়েছেন।"

চাচার কথায় বুঝতে পারছিলাম যে তিনি সুনীলের দাদুকে খুবই শ্রদ্ধা করেন। গল্প করতে করতে দেখি যে বিকেল পাঁচটা বেজে গেছে, সূর্যের আলোও ম্লান হয়ে আসছে। আমরা এসে পড়েছি একেবারে শেষে। ওখানে একটু দূরে একটা কবর ও তার উপরে লাগানো ক্রস্টা দেখে মনে হয় যে সেটা বেশ নতুন। ১৯৪৫ সালে এখানে শেষ কবর দেওয়া হলে এই কবরটাকে এত নতুন লাগছে কেন?

সুনীল চাচাকে প্রশ্ন করে, "আচ্ছা চাচা আপনি তো এখানের সব সমাধিই চেনেন। ঐটা কার সমাধি বলুন তো? বেশ নতুন লাগছে দেখতে।"

ঐ সমাধির সামনে চাচা এমন ভাবে দাঁড়িয়ে ছিলেন যে ফলকের উপর লেখা নামটা পড়া যাচ্ছিল না।

চাচা যেন সুনীলের প্রশ্ন শুনতেই পেলেন না। পাল্টা প্রশ্ন করলেন, " কটা বেজেছে দেখ তো? "

"৫.১৫ চাচা।"

হঠাৎই চাচা তাড়া লাগান। "চল চল এবার আমরা যাই। তোমরা এগিয়ে যাও। আমিও আসছি।"

গেটে তালা লাগিয়ে তিনি আমাদের দিকে তাকিয়ে বলেন, "সিমেট্রি দেখা তো হল। তবে এখানে আরও অনেক ভাল ভাল দেখার জায়গা আছে। সে সব ঘুরে ঘুরে দেখ তোমরা। এদিকে আর এসো না তোমরা... বুঝলে না... যারা চিরনিদ্রায় শুয়ে আছে, তাদের বিরক্ত না করাই ভালো। তাছাড়া এখানে যারা আছেন তাদের মধ্যে বেশির ভাগেরই অপঘাতে মৃত্যু হয়েছে... তাই বুঝলে না...সুনীল তুই কিন্তু বাবা বম্বে ফেরার আগে একবার আমার সাথে দেখা করে যাস ... আমিও কবে আছি কবে নেই..."

বাড়ি ফেরার পথে সুনীল বলল, "বাড়ি ফিরে কিন্তু দাদুকে বলিস না যে আমরা এখানে এসেছিলাম।"

সেদিন রাতে খাওয়াদাওয়া করে দাদু ঠাকুমা শুয়ে পড়বার পর আমরা গল্প করতে থাকি। রাকেশ বলে, "দিনের বেলা তো সিমেট্রি দেখলাম আর অ্যান্টনি চাচার কথাও শুনলাম। কিন্তু এই ধরনের গুজব সব পুরোনো সিমেট্রির সাথেই জড়িয়ে থাকে। ওখানে রাত্রে যেতে না পারলে তো ব্যাপারটা বোঝা যাবে না।"

সুনীল কিছুক্ষণ ভেবে বলে, "আচ্ছা তোরা যখন রাত্রে যেতে চাইছিস তার ব্যবস্থাও হয়ে যাবে। তাহলে পরশু রাতে চল। আমি এর মধ্যে সিমেট্রির চাবিটা দাদুর ড্রয়ার থেকে চুপি চুপি নিয়ে রাখব।"

(৫)

সকাল থেকে বৃষ্টি হচ্ছিল খুব। বিকেলের দিকে বৃষ্টি থামে কিন্তু আকাশে মেঘ ও এলোমেলো বাদলা হাওয়া চলছে তো চলছেই। সুনীল বলে আমরা একটু রাত করে সারে বারোটা নাগাদ বেরোব। ভালই হয়েছে আজ বৃষ্টি হয়ে। কারুর সাথে দেখা হবার চান্স নেই। যদিও এত রাতে কেউ থাকে না, তবুও সাবধানের মার নেই।

সুনীল চাবিটা ওর দাদুর ড্রয়ার থেকে চুপি চুপি নিয়ে এসেছে।

রাকেশ বলে, "আজ রাতে ওই কবরখানা ঘুরে আমি প্রমাণ করে দেব যে ভূত-তুত সব বাজে কথা, সব তোদের মনের ভুল। আর এর পর থেকে তোরা খবরদার আর আমার কাছে ভূতের গপ্পো শোনাবি না।"

যথা সময়ে আমরা বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়ি। সুনীল হাতে একটা মোটা লাঠি ও টর্চ নেয়। শো শো করে বাদলা হাওয়া বইছে। রাস্তা জনমানবশূন্য ও অন্ধকার। আকাশ মেঘে ঢাকা।

খানিক দূর যাবার পর সুনীল বলে, "আমি একটু এগিয়ে যাই। তোরা আস্তে আস্তে আয়। অনেক সময় অ্যান্টনি চাচা রাত্রেও এদিক ওদিক ঘুরে পাহারা দেয়। এতো রাতে আমাদের দেখলে দাদুর কানে কথা উঠে যাবে। আমি গিয়ে দেখে শুনে তালাটা খুলছি।"

এই বলে সুনীল জোর কদমে এগিয়ে যায়। আমরা দুজন আস্তে আস্তে চলতে থাকি।

সুনীল যাবার ১০ মিনিট পরে আমরা কবরখানার গেটে পৌঁছাই। পৌঁছে দেখি যে গেটের তালা খোলা। গেটও ফাঁক হয়ে রয়েছে।

রাকেশ ফিসফিস করে বলে, "সুনীল ব্যাটা বোধহয় ভেতরে গেছে। চল আমরাও ঢুকি।"

"সুনীলের জন্য দাঁড়ালে হতো না? একসঙ্গে তিনজনই ঢুকতাম।"

"আরে ছাড় না। ও নিচশয়ই ভেতরে চলে গেছে। আর ওকে তো ডাকাও যাবে না। গলার আওয়াজ শুনে কেউ আবার এসে পড়তে পারে।"

আমরা দুজন কবরখানার ভারী দরজা ঠেলে ভেতরে ঢুকি।

ভেতরে ঢুকে কয়েক পা এগোনোর সাথে হঠাৎ জোরে হাওয়া বইতে শুরু করে। গা শিরশির করে ওঠে। আমার এবার একটু ভয় লাগতে শুরু করে। আমি রাকেশের হাত ধরে বলি, "চল ফেরত যাই রে, জায়গাটা ভাল লাগছে না।"

রাকেশ রেগে গিয়ে বলে, "ধুর বোকা, ভয় পাচ্ছিস কেন? আর তাছাড়া সুনীলটাই বা গেল কোথায় সেটাও তো দেখতে হবে।"

আমরা আরও খানিকটা এগিয়ে যাই। রাকেশ বলে, "চল আমরা একেবারে শেষ পর্যন্তই যাব।"

আমরা আরও খানিকটা এগিয়ে যাই।

হঠাৎ-ই একটা পচা গন্ধ আমাদের নাকে আসে। "কি বিচ্ছিরি গন্ধ রে বাবা।"

রাকেশ বলে, "কুকুর বেড়াল কিছু মরেছে বোধহয়, তাই এই পচা গন্ধ আসছে। এতে ভয়ের কি আছে?"

আমরা সুরকি ঢালা পথ ধরে অন্ধকারের মধ্যে ধীরে ধীরে চলতে থাকি। কিন্তু গন্ধটা যেন পিছু ছাড়ে না।

এমন সময় হঠাৎ বিদ্যুৎ চমকে ওঠে। দূরে কোথাও কড়কড় করে বাজ পড়ে। তার সাথে সাথে শন শন করে হাওয়া চলতে শুরু করে।

আমি হঠাৎ-ই অনুভব করি যে আমাদের পেছনে যেন কেউ এসে দাঁড়িয়েছে। আমি ঝটিতি পেছন ফিরি কিন্তু কাউকে দেখতে পাই না ...

"রাকেশ এবার ফেরত চল। আর ভেতরে যাবার দরকার নেই।"

রাকেশ আমার হাত ধরে টানতে থাকে, "আরে আয় না। কিছু হবে না।"

কবরখানার প্রায় শেষ প্রান্তে এসে পড়েছি। আমি এই সময় অনুভব করি যে আমাদের কাছে কেউ আছে। ফের পেছনে তাকাই। নজর চলে না। আমার হঠাৎ মনে হয় যে একটা অন্ধকারের স্তুপ ধীরে ধীরে আমাদের ঘিরে ফেলছে।

আমি এবার বিদ্রোহ করি। "আর না। অনেক হয়েছে। এই মুহূর্তে ফেরত চল। আমি আর এক মিনিটও এখানে থাকব না।" এই বলে আমি রাকেশের হাত ধরে টানি।

আমার টানটা একটু জোরে হয়ে গিয়েছিল , তাই রাকেশ সামলাতে পারে না। পা পিছলে পড়ে যায়। আমি ওর হাত ধরে টেনে তুলতে চেষ্টা করি। এই সময় রাকেশ, যে এতক্ষণ এত সাহসের পরিচয় দিচ্ছিল , হঠাৎ ভয় পাওয়া গলায় বলে ওঠে, "উঠবার চেষ্টা করছি কিন্তু উঠতে পারছি না। আমার মনে হচ্ছে যে আমার পা কেউ ধরে রেখেছে রে।"

আমি ওর পাশে মাটিতে হাঁটু গেড়ে বসে পড়ি ও ওকে উঠবার জন্য সাহায্য করতে যাই। কিন্তু কিছুতেই ওকে ওঠাতে পারি না। রাকেশ বারবার বলতে থাকে, "আমার পা কেউ ধরে রেখেছে রে। আমি উঠতে পারছি না।"

আমি অনুভব করি যে সেই দুর্গন্ধ যা কিনা কবরখানাতে ঢোকা ইস্তক আমাদের সঙ্গী হয়েছে, হঠাৎ-ই খুব বেড়ে গেছে। তার ফলে আমাদের নিঃশ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছে। আর আমাদের চারপাশে যেন একটা কালো ছায়ার দেওয়াল উঠে গেছে। আর হঠাৎ-ই যেন এত ঠান্ডা লাগছে যে মনে হচ্ছে আমরা বরফের মধ্যে বসে আছি।

আমরা হতবুদ্ধি হয়ে পড়ি। হঠাৎ-ই কে যেন আমাকে একটা ধাক্কা মারে। আমি রাকেশের পাশে বসে পড়ি । ঠান্ডায় কাঁপতে থাকি আর কালো অন্ধকারের দেওয়াল আমাদের উপর চেপে বসতে থাকে । আমরা জ্ঞান হারাতে থাকি।

এমন সময় দূর ঠেকে একটা ক্ষীণ আওয়াজ ভেসে আসে ... সুধীর ... রাকেশ ... কই গেলি রে তোরা ?? তোরা কোথায় ... ? সুনীলের গলার আওয়াজ এটা বুঝতে পারি। অ্যান্টনি চাচারও গলার আওয়াজ শুনি ... কাহাঁ হো তুমলোগ... ?

আমাদের গলা শুকিয়ে কাঠ । তবুও আমরা দুজনে যথা সম্ভব জোরে চেঁচিয়ে উঠি ... এই যে আমরা এইখানে ... নিরেট অন্ধকার ভেদ করে একটা টর্চের আলোর রেখা দেখা যায় । বুঝি যে এটা সুনীলের টর্চের আলো ... ওদের পায়ের আওয়াজ শুনি ।... টর্চের আলোও এগিয়ে আসতে থাকে । আমার মনে হয় যে অন্ধকারের দেওয়ালটা যেন একটু দূরে সরে গেছে।

সুনীল আর অ্যান্টনি চাচা সামনে এসে দাঁড়ায় । কোনও কথা না বলে অ্যান্টনি চাচা আমাকে আর রাকেশকে হাত ধরে টেনে তোলে । তারপর চাপা গলায় বলে তাড়াতাড়ি এসো। আমরা চারজন গেটের দিকে দৌড়াতে থাকি।

গেটের বাইরে বেরিয়ে অ্যান্টনি চাচা তাড়াতাড়ি গেটে তালা লাগিয়ে দেন। তারপর বলেন, " চল তোমাদের বাড়ি অবধি ছেড়ে দিয়ে আসি।"

বাড়ির গেট থেকে খানিকটা দূরে দাঁড়িয়ে বলেন, "যাও বাড়িতে যাও। তবে আজ তোমরা যা করলে তা খুবই অন্যায় কাজ । যদি আমি ঠিক সময় না আসতে পারতাম তাহলে কি হতো বলা যায় না আর তার জবাবদিহি করতে হতো আমাকে। "

সুনীল হঠাৎ খুবই অনুনয় করে বলে, "অ্যান্টনি চাচা , এই ঘটনার কথা তুমি দাদুকে বলো না প্লিজ, দাদু শুনলে দুঃখ পাবেন । আমরা সবাই তোমার কাছেও ক্ষমা চাইছি।"

অ্যান্টনি চাচা গম্ভীর গলায় বলেন, "ঠিক আছে বলব না। কিন্তু তোমরাও আমাকে কথা দাও যে এই রকম কাজ আর করবে না। যারা চিরনিদ্রায় মগ্ন তাদের শান্তিতে থাকতে দাও ।" এই বলে অ্যান্টনি চাচা হনহন করে চলে যান।

আমরা চুপি চুপি বাড়িতে ঢুকে পড়ি। শোবার ঘরে এসে দেখি যে ঘড়িতে ২.৩০ বাজছে। অর্থাৎ আমাদের বাড়ি থেকে বেরিয়ে আবার বাড়ি ফেরা পর্যন্ত সময় লেগেছে ২ ঘন্টা।

আমাদের ঘরে এসে সুনীল বলে যে, ও আগে গিয়ে তালা খোলে। কিন্তু তারপর মনে হয় যে একবার অ্যান্টনি চাচার বাড়িতে গিয়ে দেখে এলে হয় যে চাচা জেগে নেই তো ? ও ভেবেছিল যে আমরা গেটের সামনে এসে ওর জন্য অপেক্ষা করব।

অ্যান্টনি চাচার বাড়ি ঘুরে ও যখন আবার গেটের সামনে আসে তখন দেখে যে আমরা নেই। আসলে ততক্ষণে আমরা ভেতরে ঢুকে পড়েছি। সুনীল ভাবে যে আমরা বোধহয় ভয় পেয়ে বাড়ি ফেরত গেছি। তাই ও আবার বাড়ি ফেরত আসে। আমরা বাড়িতে নেই দেখে ও আবার কবরখানায় ফেরৎ যায়।

আমাদের দেখতে না পেয়ে ও কোনোরকম সারা শব্দ না পেয়ে ও ভয় পেয়ে যায়। তাড়াতাড়ি অ্যান্টনি চাচার বাড়ি গিয়ে ডাকাডাকি করে চাচাকে তোলে। ও তারপর চাচাকে নিয়ে কবরখানায় আমাদের খুঁজতে আসে।

সেই রাতে আমরা কেউ-ই ঘুমোতে পারি না।

(৬)

পরদিন সকালে চা খেতে খেতে সুনীলের দাদু হঠাৎ বলেন, "সুনীল, তোকে একটা খবর দেওয়া হয়নি রে। গত মাসের তিন তারিখ অ্যান্টনি হঠাৎ-ই মারা গেছে। ওর শেষ ইচ্ছা ছিল যে ওকে যেন ওই কবরখানাতেই সমাধি দেওয়া হয়। যে কবরখানার ও দেখভাল করেছে, সেখানেই ও শুয়ে থাকতে চায়।

এদিকে ওই কবরখানা তো আর ব্যবহার হয় না। অনেক কষ্ট করে দেরাদুন থেকে চার্চের অনুমতি ও সরকারি অনুমতি নিয়ে ওকে ওখানেই সমাধিস্থ করেছি। একেবারে শেষের দিকে একটা ফাঁকা জায়গা পাওয়া গিয়েছিল। অ্যান্টনির জায়গায় এখনও নতুন চৌকিদার পাওয়া যায়নি।"

আমরা চমকে উঠি দাদুর কথা শুনে। আর বুঝতে পারি যে ওইদিন দিনের বেলা যে সমাধিটিকে আমাদের নতুন বলে মনে হয়েছিল সেটা কার, ও কেন সেদিন অ্যান্টনি চাচা ওই সমাধির সামনে এমন ভাবে দাঁড়িয়ে ছিলেন যাতে সমাধির উপর লেখা নামটা না পড়া যায়।

আমরা আর অপেক্ষা করি না। তিন জনে দাদুর কাছে সব কথা বলে ক্ষমা চাই।

দাদুও সব শুনে কেমন যেন হতবুদ্ধি হয়ে যান। একটু সামলে নিয়ে ধীরে ধীরে বলেন, "বড় ভালো লোক ছিল অ্যান্টনি। খুব কর্তব্যপরায়ণ। নিজের ঘর সংসার ছিল না। আমাকে খুব শ্রদ্ধা করতো আর সুনীলকেও নিজের নাতির মত ভালোবাসত। নতুন চৌকিদার কবে পাওয়া যাবে জানি না। তবে এটা জানি যে যতদিন না নতুন লোক পাওয়া যাচ্ছে, ততদিন অ্যান্টনি নিজের কর্তব্য ঠিক করে যাবে ---- মৃত্যুর পরেও।" ♦

ডাক টিকিটে বাঙালি
শুভঙ্কর ঘোষ এর সংগ্রহ থেকে

কবি মস্তান

স ম্বি তা

ফ্লুরোসেন্ট জুতো পায়ে
যায় কবি মস্তান,
কেউ তাকে দেখলে
কবিতা আওড়ান।
লিখেছিল এক কালে
কবিতা সে মস্ত,
উপহার তাই বুঝি
পেল জবরদস্ত।
এক হাতে বন্দুক
এক হাতে কলমে,
ছোটাতো সে কালি
গুলি লিখত বাংলা হরফে।
খাতা এনে দিত তাকে
বেচুরাম সরকার,
কবিতা সে লিখত
যত তার দরকার।
এক দিন খাতা, কালি
শেষ হয়ে গেল তার,
কবি মস্তান করে
কেঁদে তোলপাড়।
চিল্লিয়ে বলে সে
কবিতা কি লিখব?
খাতা কালি না পেলে
মস্তানি করব।

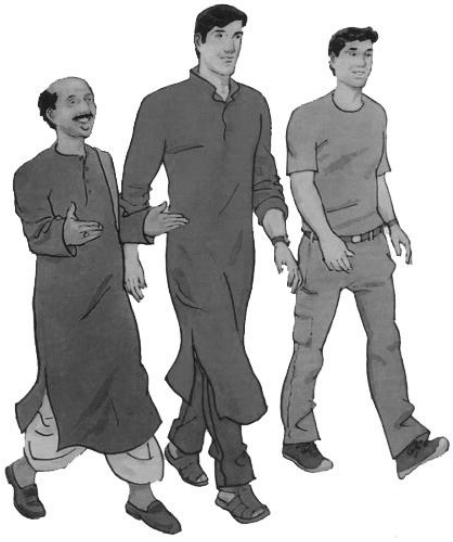

ফেলুদার প্রতি নিবেদন

র জ ত চ ক্র ব র্তী

সত্যজিতের এর সৃষ্টি তুমি
প্রিয় গোয়েন্দা ফেলুদা।

বাংলা সাহিত্যের অধ্যায় তুমি
বাঙ্গালি গোয়েন্দা ফেলুদা।

দার্জিলিং থেকে সুদূর রাজস্থান
দিয়েছো তুমি পাড়ি,

রহস্য যেথায় তুমিও সেথায়
সাথে জটায়ুর বাড়াবাড়ি।

আর আছে তোপসে স্যাটালাইট ,
মন্দার টু মগন,সব হতেই হবে টাইট।

অস্ত্র একটা আছে তোমার
যা চোখে দেখা যায় না,

আসলে সে ব্রহ্মাস্ত্র নাম তার মগজাস্ত্র,
ভূ-ভারতে যার কোনো তুলনা হয় না।

পাখিদের কলরব
চিত্র গ্রাহক : সৌম্যদীপ পাল

নতুন বছরে হোক নতুন সূর্যোদয়
চিত্র গ্রাহক : সৌম্যদীপ পাল

সূর্য ডোবার পালা আসে যদি আসুক
চিত্র গ্রাহক : রজত চক্রবর্তী

শীতের সকালে সুন্দর ফুল
চিত্র গ্রাহক : রজত চক্রবর্তী

তুষার ও লবন

সায়নদীপ চট্টোপাধ্যায়

তুমি আমার কাছে এভারেস্ট
কিংবা প্রশান্ত মহাসাগর
আর তোমার মন পর্বতের শিখর বা সাগরের গভীরতা।
তোমার শিখরে ওঠার যোগ্যতা আমার নেই,
অনেকেই হয়ত উঠতে গিয়ে অসফল
তারপর গেছে কাঞ্চন বা কারাকোরামের দিকে,
আমি উঠতে চাইনা.
বরং চরণতলে থেকে
দেখতে থাকি তোমার সৌন্দর্য
সূর্যের আলোয় তোমার শিখর যখন দীপ্ত
তৃষিত মোর চোখদুটি সেই দৃশ্যেই তৃপ্ত
পর্বতারোহী না, বরং যদি বরফ হতাম
তুষারঝরে তোমার সাথে মিশে যেতাম
সমুদ্রের গভীরে যাবার যোগ্যতাও নেই,
অনেকেই খুঁজে পায়নি তোমার গভীরতা,
চলে গেছে নদী মাপতে,
কার সাধ্যি মাপে তোমার বিশালতা !
তাদের জন্য এক মিনিট নিরবতা
আমি তোমার পাড়েই থাকি দাঁড়িয়ে
শুধু তোমার পানেই তাকিয়ে
এই অনন্তকেই করি অনুভব
ভুলে যেতে চাই আর সব গায়ে
যদি লাগে দু-এক ফোঁটা বারি
বাহ:! এই যে পরশ তোমারই
ডুবুরি না, বরং যদি হতাম নুনের মুর্তি
তোমার ভিতর গলে গিয়ে পেয়ে যেতাম মুক্তি।

ভুল ঠিকানা

সৌম্যদীপ পাল

সেমিস্টারের পরীক্ষা শেষ করে দিন তিনেক আগে বাড়ি এসেছি প্রায় মাস দুয়েক পরে। সারা বছর কলেজ, টিউশান এসব করতে করতে যখন পড়াশুনাটা প্রায় উঠে যেতে বসে তখন পরীক্ষার আগের কটা দিন নাওয়া খাওয়া ভুলে যে কি চাপ যায়, সেটা ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ুয়া ছাড়া বোধগম্য হওয়া খুব মুশকিল। তাই পরীক্ষার পরে এই সময়টা বাড়ি বসে, আহ্লাদ খেয়ে, মায়ের হাতের ভাল মন্দ রান্নায় পেট পুজো করে আবার নতুন করে লেগে পড়ার পালা।

সেদিন সন্ধ্যে প্রায় হয়েই এসেছে, কম্পিউটারে ইন্সটল করা নতুন গেমটা খুলে বসেছি। এমন সময় বাবার অফিস ঘর থেকে আওয়াজ এলো, "বাবাই আমার ঘরে একটু শুনে যাতো।"

"ধুস্, আর সময় পেলনা ডাকার !"

অগত্যা গজগজ করতে করতে পা বাড়ালাম । ঘরে ঢুকেই দেখি কতগুলো স্লিপ টেবিলের উপর পেপার ওয়েট দিয়ে চাপা দেওয়া। বাবার পাওনার হিসেব। যাদের ঠিকাদারির সরঞ্জাম সাপ্লাই দেয় তাদের কাছে প্রাপ্য। আমাকে দেখেই কাগজগুলো এগিয়ে দিয়ে বলল, "এদের কাছে এই টাকাগুলো পাওনা আছে। তুই তো এখন ফাঁকা আছিস, সময় করে আদায় করে দিস।"

শুনেই মাথায় বাজ পড়ল। উফ্, এতো লোক থাকতে আমাকেই দিতে হলো ? ধমকের ভয় একথাটা মুখ ফুটে না বেড়িয়ে পেটেই রয়ে গেল। গুনে দেখলাম পাঁচখানা স্লিপ মানে পাঁচ জায়গায় আদায়। কিচ্ছুটি আর না বলে বাইরের দিকে যেই পা বাড়িয়েছি অমনি আবার অর্ডার "কালপরশুর মধ্যেই সময় করে এনে দিস। অনেক দিন হলো পরে আছে।"

কোনো উত্তর না দিয়ে শুধু আলতো করে ঘাড় নাড়ালাম। কম্পিউটারের ঘরে ফিরেই গেম ওভার। এই গরম মস্তিষ্ক নিয়ে কি আর গেম খেলা যায় ! দুপুর বেলা খেয়ে দেয়ে সেদিন জম্পেশ একটা ঘুম দিলাম। মাংসটা হেব্বি হয়েছিল কিনা । ঘুম যখন ভাঙ্গল তখন প্রায় ৫টা। জামা প্যান্ট পরে সাইকেলটা নিয়ে বেড়নোর সময় আবার বাবার গলা, "কাজগুলো সময় মতো যেন হয়ে যায়।"

প্রথম স্লিপটার ঠিকানাটা দেখে বেশ খুশি হলাম। আমাদের ঠিক পরের গলির সতিশ কাকা। বাহ ! পরের গুলোও যেন এইরকম কাছেপিঠে হয়। কিন্তু সে ভাগ্য নেই। পরের ঠিকানাটা হলো ৪/৪, রঘুনাথপুর। আমাদের বাড়ি থেকে প্রায় ২ কিলোমিটার। যাই, আগে দুরেরটা সেরে আসি । পাড়ারটা আর পরের গুলো পরেই হবে না হয়।

সাতপাঁচ আর না ভেবে এগোলাম। বর্ষাকাল এখন। যদিও সেদিন বৃষ্টি হয়নি, তবুও একটা ম্যাজম্যাজে ভাব ছিলো। এটাসেটা ভাবতে ভাবতে এগিয়ে যাচ্ছিলাম। বাজারের উপর দিয়ে ভিড় ঠেলে আস্তে আস্তে প্রায় আধঘন্টা পেড়িয়ে গেছে । কটা বাজে দেখবো ভেবে হাতের দিকে তাকাতে দেখি ঘড়ি পড়তে ভুলে গেছি। অবশেষে পৌঁছলাম রঘুনাথপুর। ঠিকানাটা আবার একবার চোখ বুলিয়ে নিলাম। তারকেশ্বর মুখার্জী, ৪/৪ রঘুনাথপুর, ঝাড়গ্রাম, ডিউ-7500/-।

বুঝলাম ঠিক গলিতেই ঢুকেছি। আসলে ক্লাস টেনে পাসের গলিতে বাংলা পড়তে আসতাম। তাই যদিও এই গলিতে কোনদিনও ঢুকিনি, তবু চিনে নিতে সেরকম আসুবিধা হয়নি। কিন্তু হঠাৎ মনে একটা খেয়াল এলো। টাকার অঙ্কটা ছাড়া ঠিকানাটাতো বাংলায় লেখা। তাহলে বাড়ির নম্বরটা ৪/৪ না ৮/৮? ভাবলাম বাবাকে একবার ফোন লাগাই। তারপর মনে হলো থাক, এসেই যখন পরেছি তখন এটা না হলে ৮ নম্বর গলিতেই যাব। এইতো চারখানা গলি পরেই। এইসব ভাবতে ভাবতেই সাইকেল ঠেলতে ঠেলতে পা বাড়ালাম।

গলির ডানদিকের একদম শেষ বাড়ি এটা। বাড়িটা দেখে একটুও ভক্তি হলোনা। বাঁশের বেড়ার গেটের ওপারে দেওয়ালে শেওলা পরা একতলা একটা বাড়ি। গেট ঠেলে ভেতরে ঢুকলাম। সামনে আগাছা ভরা ফিট দশেক যায়গা। গেটের সামনে, আর সদর দরজাটা ছাড়া যত্রতত্র আগাছা জমেছে। হয়তো বর্ষাকাল বলে। বাড়ির নামের ফলকটার এমন জীর্ণ দশা যে আমি যদি বাড়ির রূপ দর্শন করতে গিয়ে এত চর্চা না করতাম তাহলে চোখে পড়ত কিনা সন্দেহ।

"ছোটো গল্প", ৪/৪ রঘুনাথপুর, ঝাড়গ্রাম।

এমন বাড়ির এই সৌখীন নামের বাহার দেখে অস্ফুটে মুখ থেকে বেড়িয়ে পড়ল "বাব্বাহ ! নাটক !"

খালি এটাই আশ্চর্য হলাম যে, এই যদি বাড়ির ছিড়ি হয় তাহলে এরা বাবার কাছ থেকে চুনসুড়কি বা অন্য মেরামতির সরঞ্জাম কিনে করলটা কি! ধুস্, চুলোয় যাক। টাকাটা আদায় করে বাবাকে দিলে যদি কিছু বকশিস দেয়, তাহলেই অনেক। কোনো কলিংবেল চোখে পড়ল না। অগত্যা দারজার কড়া ধরেই বার দুয়েক ঠকঠক করলাম। কোনো সাড়াশব্দ নেই। কড়া নাড়ার শব্দটা আমারই কানে প্রতিধ্বনি হয়ে বাজল। সেকেন্ড তিরিশ পাড় হয়ে গেছে। এদিকে কোনো লোকজনও দেখছিনা যে জিজ্ঞাসা করবো। বিরক্ত হয়ে আবার কড়া নাড়ালাম। এবার বেশ জোরে। কিন্তু

এবারও একই হাল। কোনো সাড়াশব্দ না পেয়ে পেছন ফিরেছি, অমনি যেন কি একটা শব্দ হলো।

"কিছু বলছেন? কাকে চাই?" প্রশ্নদুটো প্রায় একসঙ্গেই কানে এলো। পেছন ফিরে এবার প্রশ্নকর্তাকে পর্যবেক্ষণের পালা। গলার স্বর শুনেই বুঝেছি বয়স্ক লোক। গায়ে সস্তার পাজামা-পাঞ্জাবি, তাও বেশ ময়লা গোছের। ভালোই রোগা। মাথায় উস্কখুস্ক চুল আর মুখে এক গাল দাড়ি। প্রশ্নটা উনি আবার করলেন, "কাকে চাই?"

"আজ্ঞে, আমি সুবির বাবুর ছেলে। বাবা আপনাকে এই রশিদটা দিয়েছেন। আর যদি টাকাটা দেন তাহলে খুব ভালো হয়।" মনে হচ্ছে আজ হয়তো খালি হাতেই বাড়ি ফিরতে হবে।

উত্তর এলো "ও আচ্ছা, বাবা তুমি ভেতরে এসো।"

বললাম "না না ঠিক আছে। আমি এখানেই ঠিক আছি।"

"আরে বাইরে দাঁড়িয়ে থাকবে কেন? ভেতরে এসে বোসো। এখানে বড্ড মশা।"

তা অবশ্য ঠিক। এই মিনিট পাঁচেকেই মশক কূল আমাকে যা কামড়েছে তাতে এই অপশানটা আর দুবার ভাবলাম না।

এদের ড্রয়িংরুমটা বেশ ছোটো। সোফাটায় আমি যেখানে বসেছি তার ঠিক উল্ট দিকেই টিভিটা বসানো। সম্ভবত ভারতে টিভি আসার প্রথম দিকের ভার্শান। ব্র্যান্ড খুঁজতে গেলে গুগল সার্চ করতে হবে। মাথার উপর ছোটো সাইজের একটা ঝাড়বাতি। একখানা বাল্ব নিয়ে টিমটিম করে জ্বলছে। একটা আধো অন্ধকার ভাব। ড্রয়িংরুম থেকে বেড়িয়েই পাশাপাশি আরো দুটো ঘর দেখা যাচ্ছে। সেদুটোই অন্ধকার।

এই বাড়িতে এই বুড়ো ছাড়া আর নিশ্চই কেউ থাকেনা। এই সব ভাবনা মাথার মধ্যে ঘুরতে লাগল। এদিকে উনি এসে আমার ডানদিকের সোফাটায় বসেছেন। আমি তখনো এদিকওদিক নজর ঘোরাচ্ছি। একটা ব্যাপার বেশ বুঝতে পাড়ছি যে এই বাড়িটায় প্রতিটা জিনিস বেশ পুরু ধুলো পরা। আমার কালো জিনস্টার উপর সোফার সাইডের লম্বা ধুলোর ছাপটা তার প্রমান দিচ্ছে।

"কি পড়ছো তুমি? এখানে থাকো না নিশ্চই।" আমার ব্যাপারে এসব খুঁটিনাটি জানা মোটামুটি শেষ করে উনি কথা বলতে শুরু করেছেন। "আমার ছেলেও কম্পিউটার ইঞ্জিনিয়ার। সিঙ্গাপুরে থাকে। এখানে আসার সময়ই পায়না। প্রায় বছর দুয়েক আসতে পারেনি।"

"তোমরাও হয়তো বাইরে যাবে। কিন্তু বাবা মাকে ভুলো না যেন।"

কথাগুলো আগেও অনেক গুরুজনদের থেকে শোনা। কিছু স্বার্থপর লোকদের স্বার্থসিদ্ধির জন্য বয়স্ক মানুষদের পুরো জেনারেশানটাকে ভুল বোঝার একটা প্রভাব।

একথা সেকথা করে মিনিট পনেরো কাটল আরও। টাকার কথার কোনো উচ্যবাচ্য করছেননা উনি। আর আমিও বাড়ি যাবার জন্য অস্থির হয়ে যাচ্ছি। তাড়াতাড়ি ফিরতে পারলে যদি পাড়ার মাঠে কারোর দেখা পাই। অগত্যা নিজেই জামার পকেট থেকে স্লিপটা বার করে ওনার দিকে এগিয়ে দিতেই অন্ধকার।

"যাহ! আবার লোডশেডিং।"

কথাগুলো শুধু কানে এলো। অন্ধকারেও কোনোকিছু সামনে থাকলে যেমন একটা আঁচ পাওয়া যায় এখানে ওসব নেই। যেন কতকালের অন্ধকারে ডুবে গেলাম। খালি এটাওটা হাতড়ে কিছু খোঁজার শব্দ কানে আসছে। দেশলাই ধরানোর শব্দ এলো এবার। দুবারের চেষ্টায় মোমবাতি জ্বলতে যেন প্রাণ ফিরে পেলাম। টেবিলে রাখা মোমদানিতে মোমবাতিটা আটকালেন উনি।

"দাঁড়াও, তোমার বাবার পাওনাটা এনে দি। অনেক হলো বাকি আছে।" বলে পাশের দুটো ঘরের একটায় ঢুকে গেলেন। আমিও পকেট থেকে মোবাইলটা বেড় করে গেম খেলতে লাগলাম। একা একা বসে বোর হওয়ার চেয়ে এটা অনেক ভালো।

চারিদিকে একটা অদ্ভুত ধরনের নিস্তব্ধতা। ঘড়ির কাঁটার টিকটিক শব্দটাও এই বাড়িতে নেই। দেওয়ালে তাকিয়ে দেখলাম কোনো এক কালের ৮টা ২০তেই সেটার আয়ু ফুরিয়েছে। অতএব আমার মোবাইলই ভরসা।

কতো দেরি হয়ে গেলো। আজ আর মাঠে কারোর দেখা পাবোনা। একটা টাকা আনতে এতো সময় লাগে! এই ভেবে গজগজ করছি। ওঘর থেকেও কোনো সাড়াশব্দ নেই। হঠাৎ মনে হলো এই নিস্তব্ধ পরিবেশে একটা পিন পড়লেও শোনা যাওয়ার কথা, আর একটা জ্বলজ্যান্ত লোক পাশের ঘরে টাকা আনতে গেলো তার কোনো শব্দ নেই!

আমার একটু ভয় ভয় করতে শুরু করেছে। যে ঘরটায় উনি ঢুকেছিলেন মোমবাতিটা টেবিল থেকে নিয়ে সেই ঘরটার দিকে আস্তে আস্তে পা বাড়ালাম। কিন্তু পা যেন সড়ছে না কিছুতেই।

"শুনছেন? কেউ আছেন?"

কথাগুলো ফাঁকা ড্রয়িংরুমে আমার কানেই ফিরে এলো। কোনো সাড়া নেই। ঘরের চৌখাট ডিঙ্গোতেই মোমের আলোয় স্পষ্ট চোখে পড়ল ঘরের মধ্যে বড় একটা খাটের উপর চাদর মুড়ি দিয়ে কেউ শোয়া আছে। চাদরের তলা থেকে হাতটা বেড়িয়ে খাটের পাশে ঝুলছে। শুধু হাড়। হাতের শাঁখাটা রয়ে গেছে এখনো। দৃশ্যটা দেখে গা হিম হয়ে গেলো। এবার চোখটা পলকের মধ্যে বন্ধ করে যেই না উপরে তাকিয়েছি আবার আরেকটা ঝটকা। সিলিঙ্গের থেকে একটা কঙ্কাল ঝুলছে। গলায় দড়ি দেওয়া। পড়নে সেই বুড়োর মতো একইরকম পাজামা-পাঞ্জাবি।

এরপর আমার চোখ যখন খুললো আমি তখন ঝাড়গ্রাম হসপিটালের এক কেবিনে। বাঁহাতে প্লাস্টার। সামনে বাবা, মা আর একজন অপরিচিত লোক দাঁড়িয়ে। বাবা বললেন "তুই ৪ নম্বর গলিতে গেলি কেন? আমি তকে ৮/৮-এ তারকবাবুর ঠিকানা লিখে দিয়েছিলামতো। এই দেখ তারকবাবু এসেছেন তোর খবর পেয়ে।"

এরপর আমার খাওয়া দাওয়া নিয়ে এক প্রস্থ বকাবকি হলো। কারণ বাবার ধারণা আমি মাথা ঘুড়ে পরে গিয়েছিলাম। কথায় কথায় জানলাম যে কাল অনেক রাত অব্দি বাড়ি না ফেরায় খোঁজ করতে করতে আমায় ওই বাড়ির গেটের সামনে অজ্ঞান অবস্থায় পাওয়া যায়। বাড়িটায় ঢুকে পাড়াপড়শি কঙ্কাল দেখে পুলিশে খবর দেয়। একটা সুইসাইড নোটোও পাওয়া গেছে।

"আমেদের মৃত্যুর জন্য কাউকেই দায়ি করার নেই। সন্তানে মানুষ করার পরও অবহেলার কষ্টটা সহ্য কড়ার চেয়ে আত্মহত্যা হয়তো অনেক সহজ। সুলোচনা আজ সকালে হার্ট অ্যাটাকে মাড়া গেছে। আমার এই পৃথিবীতে অবহেলায় একা বেঁচে থাকার কোনো ইচ্ছে নেই। তাই এই পথই বেছে নিলাম। জানিনা কবে মুক্তি পাবো।
-ইতি
বিবেক বন্দ্যোপাধ্যায়, ১২/১০/২০১৪"

বাবার মুখে চিঠির বয়ান শুনে আমার হাত পা আবার ঠাণ্ডা হয়ে গেলো। আমার স্পষ্ট মনে আছে কালকের সেই ভদ্রলোকের কথাগুলো। গায়ে আবার কাঁটা দিচ্ছে।

"একটু আসছি" বলে বাবারা সবাই বেড়িয়ে গেলো। পাশ ফিরতে গিয়ে আমার পড়নের কালো জিনস্টার কাগজের মতো কি একটা মনে হোলো। বার করতে দেখলাম কয়েকটা নোট রাবার দিয়ে রোল করে মোড়া। গুনে দেখলাম ঠিক ৭৫০০ টাকা। ♦

জন্ম জন্মের বন্ধন
চিত্র গ্রাহক : শুভঙ্কর ঘোষ

আমাদের ছোটবেলায় দেখা গোয়েন্দা কার্টুন স্কুবি ডু ...
দিপান্বীতা ভট্টাচার্য এর আঁকা ছবি

সুখের সন্ধান

মোঃ আঃ মুকতাদির

ভরা ক্ষেতে চেয়ে ভাবি
বৈশাখের দুপুরে,
সুখ কি ডেকেছে আমায়
নির্জন প্রহরে?
শ্রাবণের জলধারায়
নয়ন মেলে দেখি,
সুখ কি চিরকাল
আমায় দিচ্ছে ফাঁকি?
নবনীল গগণে
চোখ পড়ে আশ্বিনে,
সুখ বোধহয় পাব আমি
ভবিষ্যতের নিয়ম মেনে।
কার্তিকের হলুদ ক্ষেত
বলে আমায় ওরে,
ভবিষ্যতের সুখের আশায়
বর্তমান কেউ ছাড়ে?
মাঘের প্রভাতে
মন বলছে আমায়,
বর্তমান তোর পড়েছে ঢাকা
রোদ যেমন কুয়াশায়
চৈত্রের রাত্রিতে
টানি যবনিকা,
বর্তমানের সুখই আসল
ভবিষ্যৎ মরীচিকা।

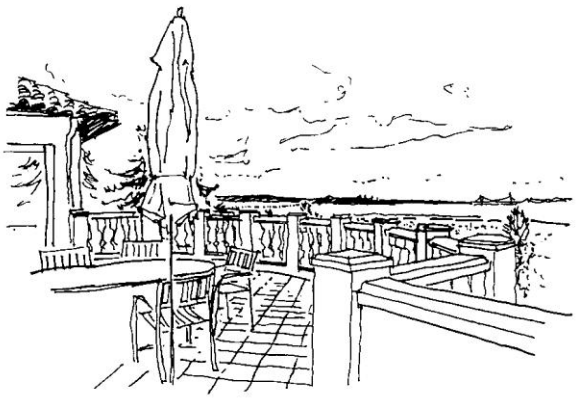

তোমার আমার ছাদ

শিবাদিত্য দাশশর্মা

একটা শান্ত দুপুর শেষ হল
আজ ছাদের পাঁচিল ঘেঁষে,
একটা আকাশ ভরা নক্ষত্র
চাঁদের গলায় ফেঁসে।
আমার ছাদ না তোমার ছাদ
রোজ চলছে কাড়াকাড়ি,
দূরে কোথাও মন খারাপে
ছাদে এসে ছাড়লে গানের গাড়ি।
আমার ছাদে বেজায় হাওয়া
ফুলের গাছ আর বিড়াল ছানা,
তোমার ছাদে
এক পশলা বৃষ্টি দিল হানা।
আমার ছাদে ওই কোণাতে
সূর্য ওঠে রোজ,
তোমার ছাদে পা বাড়ালেই
স্বাধীনতার খোঁজ।
তোমার ছাদটা দেখবো বলে
মেঘের ফাঁকে উঁকি,
আজ তোমার আমার ছাদের মাঝে
একটু খানি ঝুঁকি।

আমাদের প্রকাশিত পূর্ববর্তী সংখ্যা সমুহ

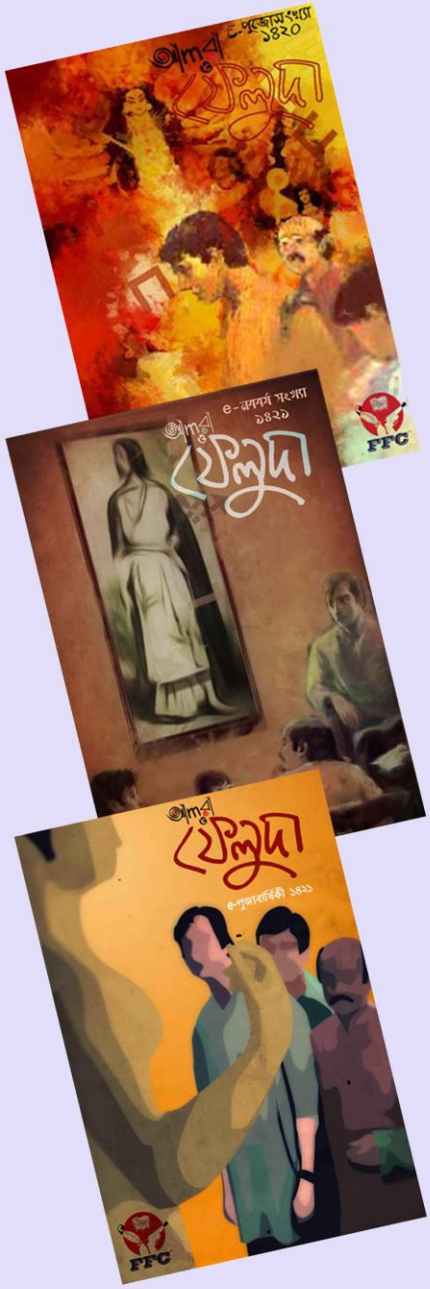

আমরা ও ফেলুদাঃ e-পূজাবার্ষিকী ১৪২০

Download

আমরা ও ফেলুদাঃ e-নববর্ষ সংখ্যা ১৪২

Download

আমরা ও ফেলুদাঃ e-পূজাবার্ষিকী ১৪২২

Download

ফেলুদা ফ্যান ক্লাব

A Community of Feluda Lovers

Join us

https://www.facebook.com/groups/feluda.3musketeres

Like us

https://www.facebook.com/feludafanclub

https://www.facebook.com/amraofeluda.ffc

Contact us

Email: ***feludafanclub.01@gmail.com***

FFC